সোনাপুর বউ

শামসুন্নাহার রহমান পরাণ

বাঁচা মরার সংশয়ের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ এর ঝঞ্ঝাময় দিনগুলো পার করার পর দেশ যখন স্বাধীন অর্থাৎ সেই ১৯৭২ সাল থেকে যাকে খুঁজেছি সেই খঞ্জনীর দেখা পেলাম এইতো সেদিন। তার বাপের বাড়ীর পাশে অচ্ছুত বলে বিহ্নিত এক কোণে। দীর্ঘ ২৮ বছর মানিকের গ্রামবাসী তার বাপের বাড়ীর নামটি আমাকে বলেনি। ভয়ে, সেই ভয়ঙ্কর ব্যক্তিদের ভয়ে। যারা ১৯৭১ সালে মানিকের বিধবা সুন্দরী যুবতী বৌটাকে পাক সেনাদের হাতে সুকৌশলে তুলে দিয়ে নিজেদের হীনস্বার্থ চরিতার্থ করেছিলো আর এই গুটিকয়েক বাঙালি নরপশুদের বিষয়টি ছিলো সীমান্তে কালোবাজারি সীমান্ত ব্যবসা নিরাপদ করা।

মেয়েটির নাম খঞ্জনী- আর ওর স্বামীর নাম মানিক। ওদের ছিলো এক মেয়ে আর এক ছেলে। খেয়ে পড়ে ভালোয় চলতো মানিকের। হঠাৎ তাকে কোনো এক কাল ব্যাধিতে পেয়ে বসে। চিকিৎসার জন্যে প্রায় সব জমি সে বিক্রি করে ফেলে। কিন্তু তারপরও শেষ রক্ষা হয়নি। মানকি খুব সামান্যই জমি জমা রেখে মারা গেলো। আর মানিকের বৌ খঞ্জনী হলো বিধবা। বিধবা সুন্দরী যুবতী ঘরেই াকতো। তার চার বছরের মেয়ে রোকসানার হাত ধরে বৃদ্ধা শাশুড়ী বাড়ি বাড়ি বাড়ি কাজ করতো। এই শ্রমের বিনিময়ে যা পেতো তারা তাতে দাদী-নাতনীর আহার হয়ে যেতো। উপরন্তু পড়ন্ত বিকেলে ঘরে ফেরার সময় কিছু ভাত তরকারি নিয়ে যেতো সে বৌ এর জন্যে। শাশুড়ী বড়ো বড়ো গৃহস্থ বাড়ি থেকে ধান সংগ্রহ করে দিত আর তাই দিয়ে মানিকের বৌ ঢেঁকিতে কুটে চাল করে দিত। বিনিময়ে পারিশ্রমিক পেতো খুদ কুড়ো আর কয়েক সের চাল। এই ছিলো তাদের আয়ের উৎস। তার দিন এভাবে কাটছিলো। খঞ্জনীর মাথা গোঁজার ঠাঁই বলতে একটা ঘর ছিলো ধান কোটার একটি ঢেঁকি ছিলো। যাকাতের কাপড়ে তালি দিয়ে বছর পার হতো। শাশুড়ী বৌ এর। কোনো রকমে বাচ্চু দুটোকে বুকে ধরে স্বামীর ভিটা আঁকড়ে থাকতো খঞ্জনী। সচ্ছল বাপের বা যায় নি দ্বিতীয় বিয়ের ভয়ে। ওর বাচ্চাদের অসুবিধা হবে এই ভয়ে। কিন্তু নিয়তির কি নির্মম পরিহাস মানিকের নিষ্ঠাবান সহজ সরল বৌটাকে দ্বিতীয় বিয়ের প্রহসনের খেলায় জড়িয়ে যেতে হয় দেশের শত্রু জাতির শত্রু পাক সেনাদের সঙ্গে।

১৯৭১ সাল। কুমিলা জেলার চৌদ্দগ্রাম থানার ১০নং জগন্নাথ দিঘী ইউনিয়নের সোনারপুর গ্রাম। সেখানকার কিছু ব্যক্তি কালোবাজারি, সীমান্ত ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ছিলো। এরা ছিলো এলাকার শান্তি কমিটির লোকজন। দেশীয় এসব দালাররা পাকিস্তানীদের সঙ্গে হাত মিলায়। মানিকের পরিবারটি ছিলো এই গ্রামে খুবই অরক্ষিত। সব হারাদের যা হয়। মানিকের বৌটা ছিলো স্বাস্থ্যবতী ও যথেষ্ট সুন্দরী। ঘরের বাইরে না হলেও মানিকের বৌ খঞ্জনী এই নরপশুদের চোখে পড়ে যায়। তখন তারা খঞ্জনীকে নানা রকম উস্কানী ও প্রলোভন দেখাতে চেস্টা করে। কিন্তু মেয়েটি কিছুতেই রাজি হয়নি। ওদের উদ্দেশ্য যে তারা মেয়েটিকে পাকিস্তানী সেনাদের এক সুবাদারের হাতে তুলে দেবে ভেট হিসেবে। খঞ্জনীকে তারা যখন কোনোভাবেই বশে আনতে পারে না তখন শরু করলো ভয় দেখাতে এ্ বলে যে তোমাকে সুবেদার সাহেব বিয়ে করবেন তুমি

যদি এ বিয়েতে রাজি না হও তাহলে তোমার বাড়িসহ গ্রাম জ্বালিয়ে দেবে ওরা। অভাব অনটন ভয় প্রলোভনের দোলায় দুলতে দুলতে রাজি হয় খঞ্জনী। শান্তি কমিটির দালাল আর সীমান্তের কালোবাজারীদের চক্রান্তের গড়া প্রহসনের পিঁড়িতে বসে খঞ্জনী। এই নরপশুর দোষরেরা খঞ্জনীকে বুঝিয়েছিলো যে ওরাও মুসলমান, তুমিও মুসলমান। বিয়ে করলে অসুবিধা কোথায়? ভীত অসহায় বৌটি পাক দারালদের প্রতাপের স্রোতে কোরের শিমুকে শাশুড়ীর কোলে দিয়ে জগন্নাথ দীঘির পাড়ির পর সেনাদের ছাউনিতে যায়। প্রথম দিকে ৪/৫ দিন পর পর সে বাড়িতে বাচ্চাদের কাছে আসতে পারতো। কিন্তু সঙ্গে থাকতো ২/৩টি পাক হানাদার। ওরা হাঁক দিয়ে ভয়ে ভয়ে খঞ্জনী ওদের অনুসরণ করতো। প্রথম প্রথম ওরা খঞ্জনীর সঙ্গে নমনীয় ব্যবহার করলেও কিছুদিন পর ওরা তার সঙ্গে গণপশুর মতো ব্যবহার করতে শুরু করে। পালিয়ে আসতে চেষ্টা করে কিন্তু পরে না।১৯৭১ সালের জুন মাসের মাঝামাঝি সময় হানাদার বাহিনী কর্তৃক সে অপহৃত হয় এবং প্রচন্ড নির্যাতনের স্বীকার হয। এদিকে খঞ্জনী পাক হানাদারদের হাতে আটকা পরে যায়। মায়ের অভাবে অযত্নে কোলের ছেলে মতিন পাঁচ মাসের মধ্যেই মারা যায়। মানুষ যখন বাঁচার তাগিদে ছুটে বেড়াচ্ছে খঞ্জনী তখন ঘৃণ্য পাক বাহিনীর বিকৃতির ক্রিড়নক।

স্বাধীনতার ২/৩ দিন পর খঞ্জনী বিদ্ধস্ত দেহে ফিরে আসে গ্রামে। কিন্তু যে গ্রামকে বাঁচানোর জন্য যে গ্রামের মানুষদেরকে রক্ষার জন্যে সে নিজেকে বিসর্জন দিলো, সেই গ্রাম সেই সমাজের মানুষ তাকে গ্রহণ করলো না। ঠাঁই হলো না তার কারো কাছেই। কিছুদিন ভবঘুরে অবস্থায় সে ঘুরে বেড়ায় এবং এক পর্যায়ে সে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে ও সম্পূর্ণ মানবেতর জীবন যাপন করতে থাকে। আর এদিকে মানিকের বুড়ি মা নাতনীকে সঙ্গে নিয়ে বিত্তশালীদের দ্বারে দ্বারে ঘুরে দিন কালাতিপাত করতেন। তাঁর মৃত্যুর পর মানিক খঞ্জনীর বাড়ী ভিটা বেদখল হয়ে যায়। বর্তমানে করিম বক্সের ছেলের দখলে আছে। এসব জায়গার কাগজপত্র কোথায় থেকে কোথায় চলে গেছে কেউ জানে না।

মানসিক ভারসাম্যহীন খঞ্জনী আজ এখানে তো কাল ওখানে করে ঘুরে বেড়ায়। মেয়ে রোকসানা শিশু শ্রমিক কুমিলা শহরে। আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি। শুনেছি মানিকের বৌ মাজারে মাজারে ঘুরে। সর্বত্র খুঁজে বেড়াচ্ছি দীর্ঘদিন ধরে।

যে সমস্ত লোক খঞ্জনীকে পাক বাহিনীর হাতে তুলে দিয়েছিলো। তাদের দু'জন মারা গেছে। এদের আত্মীয়-স্বজনরা এখন ধনী। এদের একজন চরম রাজাকার, বর্তমানে কানাডাবাসী। ভয়ে এলাকায় আসে না। ওখানে নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করে পরিবার নিয়ে গেছে। মানিকের ঘরের পাশের আত্মীয়-স্বজনরা ছিলো সব কালোবাজারী আর শান্তি কমিটির সদস্য ও রাজাকার। বর্তমানে তারা সেখানে অর্থনৈতিক দৃঢ়তা অর্জন করে প্রতাপ ও প্রভাবশালীর ভূমিকায় অবতীর্ণ। তারাই সেখানে দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। তাই কেউ সাহস করে আর মুখ খোলে না। খঞ্জনীর বিষযে প্রশ্ন করে কারো কাছে কিছু জানতে পারিনি। স্বাধীন দেশেও পরাধীনতার গোলামীতে ভুগছে সরল প্রাণ গ্রামবাসী। এদের মুখ তেকে অত্যাচারীর এঁটে দেয়া ছিপি খুলতে দীর্ঘ সময় লাগলো আমার। অবশেষে কৌশলের আশ্রয় নিলাম। বললাম মানিকের এতিম মেয়ের জন্যে কিছু করতে চাই। এতে কাজ হলো জানলাম মেয়ের খোঁজ। এই লতা ধরে খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে গেলাম

খঞ্জনীকে। বাপের বাড়ীতে অবস্থাপন্ন এক আত্মীয়ের গোয়াল ঘরে অচ্ছুত হয়ে পড়ে আছে এক কোণে। কিছুই বলতে পারে না। কথা বলতে চায় না। কারো বিরুদ্ধে যেনো কোনো অভিযোগ নেই বয়ে জড়সড় ভালো করে চিনতেও পারে না কাউকে। শুধু দীর্ঘকাল পর নিজের মেয়ে রোকসানাকে ফিরে পাওয়ার আনন্দ চোখে, মুখে চিক চিক করছে। ঘরে সম্বল বলতে কয়েকটি ছিন্ন বস্ত্র। একটা/দুইটা হাঁড়ি পাতিল। আমি নোটারী ক্লাবের মাধ্যমে তাকে পুনর্বাসন করার চেষ্টা করলাম। আমি একটা 'ঘাস ফুল' নামে এনজিও পরিচালনা করি। আমি চিটাগাং রোটারী ক্লাবের সহযোগিতায় খঞ্জনীর জন্য কাপড়, চোপর, বিছানা, বালিশ, কাঁথা, সাবান অর্থাৎ নিত্য ব্যবহার্য জিনিস ক্রয় করে দিলাম। এদিকে কন্যা রোকসানার যথেষ্ট বয়েস হয়েছে। মায়ের প্রতি তীব্র ভালবাসা অনুভব করলেও অভাবে তার কিছুই করার নেই আসলে। তাই আমরা তার স্বামী ফুলমিয়া এবং রোকসানাকে একটি রিকশা কিনে দিয়েছি। রোকসানা তার মাকে দেখে রাখবে। লিখিতভাবেই সেই ব্যবস্থা করা হয়েছে। দেখে রাখবে '৭১-এর এই মহান নারীকে যে গ্রামের মানুসের জন্যে দেশের মানুষের জন্যে নিজেকে বিসর্জন দিয়ে তুলে নিয়েছিলো ঘৃণ্য কিছু নরপশুর ঢেলে দেয়া বিষ।

শামসুন্নাহার পরান, চেয়ারম্যান, ঘাসফুল (এন.জি.ও), পশ্চিম মাদারবাড়ী, চাটগাঁ

লেখিকা পরিচিতিঃ

শামসুন্নাহার রহমান পরাণ আধুনিক বাংলাদেশের নারীসমাজে একজন বেগম রোকেয়া। তার জন্ম রংপুরের পায়রাবন্দে নয়, তিনি কুমিলাতে জন্মগ্রহণ করলেও জীবনের প্রায় সর্বাংশ অতিবাহিত করেছেন চট্টগ্রামের খেটে খাওয়া জনতার সংস্পর্শে। সমাজে উপেক্ষিত ও নিগ্রীহিত জনতার পাশে দাঁড়াতে তিনি 'ঘাসফুল' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছেন। 'পরান-আপা' নামে তাঁকে চট্টগ্রামের সুশীল সমাজের সকলেই চেনেন। তিনি আমাদের কর্ণফুলী'র একজন নিয়মিত পাঠক এবং শুভাকাঙ্খী। তিনি কর্ণফুলী'র জন্যে নিয়মিত লিখবেন, সে প্রতিশ্রুতিতে তাবৎ বিশ্বে আমাদের পাঠকদের জন্যে চট্ জলদি পাঠিয়ে দিলেন জীবনভিত্তিক এক গুচ্ছ ছোট গল্প। আমরা এখন থেকে ধারাবাহিকভাবে তাঁর অপ্রকাশিত এ গল্পগুলো ছাপবো। পড়ে সুধী পাঠকদের কেমন লাগলো জানালে আমাদের ভালো লাগবে।